

গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

ভূমিকা

ভারতীয় সংস্কৃতির মূল যে উপাদানগুলি রবীন্দ্রমানসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল তার মধ্যে ‘রামায়ণ’ এবং ‘মহাভারত’ – এই দুই মহাকাব্যের অবদান অভূতপূর্ব। তিনি তাঁর সাহিত্যে বারবার এই দুই মহাকাব্যের প্রসঙ্গ এনেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’ – এই দুই মহাকাব্য থেকে বিভিন্নভাবে তাঁর সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু সেই উপকরণগুলি তিনি সরাসরি তাঁর সাহিত্যে প্রয়োগ করেননি। তিনি নানাভাবে সেই সাহিত্যিক উপকরণগুলির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তাঁর সাহিত্যে। আর সেই সাহিত্যিক পরীক্ষাকেই অ্যাড্যাপ্টেশন্ তত্ত্বের আলোকে আমি দেখতে চেয়েছি। পাশ্চাত্য তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচনার ধারায় অ্যাড্যাপ্টেশন্ তত্ত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর সেক্ষেত্রে প্রথমেই যে বইটির প্রসঙ্গ উল্লেখ করা জরুরী তা হল লিভা হাচিওন-এর ‘এ থিওরি অফ অ্যাড্যাপ্টেশন্’ বইটি। এই বইতে লিভা অ্যাড্যাপ্টেশন্ থিয়োরিকে নানা ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’ – এই দুই মহাকাব্যের থেকে উপকরণ সংগ্রহ করলেও কীভাবে তা রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্র সৃষ্টি হয়ে উঠেছে – তা অ্যাড্যাপ্টেশন্ থিয়োরির সাহায্যে অনুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করাই আমার গবেষণাকর্মের লক্ষ্য। ভূমিকা অংশে, কীভাবে রামায়ণ ও মহাভারত-এর ঐতিহ্যপূর্ণ ধারা রবীন্দ্রনাথের মনে আবেগের সঞ্চার করেছিল, তার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস ব্যক্ত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এই গবেষণা প্রকল্পের মূল স্বরূপ আলোচনা ও বিশ্লেষণের দৃষ্টিকোণটির ধারণা দেওয়া হয়েছে। অ্যাড্যাপ্টেশন্ থিয়োরি আসলে কী এবং কেন ‘অ্যাড্যাপ্টেশন্’-কে গ্রহণ এবং প্রতিগ্রহণ বলা হচ্ছে তার সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিশ্লেষণের পাশাপাশি রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রতিটি সংরূপে কীভাবে ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’ – এই মহাকাব্যদ্বয়ের অ্যাড্যাপ্টেশন্ তথা গ্রহণ-প্রতিগ্রহণ হচ্ছে, সেটি আলোচনার মাধ্যমে গবেষণা কর্মটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। গবেষণা প্রকল্পটি ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়া নিম্নলিখিত মোট ছ’য়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে –

প্রথম অধ্যায় :	অ্যাড্যাপ্টেশন্ থিয়োরির সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিশ্লেষণ
দ্বিতীয় অধ্যায় :	রবীন্দ্র মননে ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’
তৃতীয় অধ্যায় :	রবীন্দ্র কাব্যসাহিত্যে ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’-এর গ্রহণ-প্রতিগ্রহণ
চতুর্থ অধ্যায় :	রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যে ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’-এর গ্রহণ-প্রতিগ্রহণ

পঞ্চম অধ্যায় :	রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’-এর গ্রহণ-প্রতিগ্রহণ
ষষ্ঠ অধ্যায় :	রবীন্দ্র প্রবন্ধসমগ্র ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’-এর গ্রহণ-প্রতিগ্রহণ

প্রথম অধ্যায়

অ্যাড্যাপ্টেইশন্ থিয়োরির সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিশ্লেষণ

অ্যাড্যাপ্টেইশন্ থিয়োরির সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিশ্লেষণ ছাড়া লেখকের রচনার বিশ্লেষণ করে যথার্থ সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় না। তাই অ্যাড্যাপ্টেইশন্ থিয়োরির সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রথম অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। সেক্ষেত্রে যে বইটির প্রসঙ্গ উল্লেখ করা জরুরী তা হল লিভা হাচিওন-এর ‘এ থিওরি অফ অ্যাড্যাপ্টেইশন্’ বইটি। এই বইতে লিভা অ্যাড্যাপ্টেইশন্ থিয়োরিকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এই অধ্যায়ে অ্যাড্যাপ্টেইশন্ থিয়োরির বিশ্লেষণের পাশাপাশি এর প্রতিশব্দ হিসেবে কেন ‘গ্রহণ-প্রতিগ্রহণ’ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে তার পরিচয়ও তুলে ধরা হয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্যে ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’ – এই দুই মহাকাব্য কীভাবে গৃহীত হয়েছে এবং সেই গৃহীত উপাদান রবীন্দ্রিক মহিমায়, তাঁর সৃষ্টিশীলতায় কীভাবে নতুন রূপে, কখনও নতুন আঙ্গিকে হয়ে উঠছে রবীন্দ্রনাথেরই স্বতন্ত্র সৃষ্টি তার ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে এই অধ্যায়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্র মননে ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’

মানবজীবন ও সাহিত্য একে অপরের পরিপূরক, কারণ মানবজীবনের অভিজ্ঞতাসঞ্চার অনুভূতি লেখকের হৃদয়রসে জারিত হয়ে সাহিত্য মুকুরে প্রকাশিত হয়। তাই কোন লেখকের সাহিত্য ভাবনার প্রকৃত স্বরূপকে উপলব্ধি করতে হলে, তার জীবন-ইতিহাসের প্রতি আলোকপাত জরুরী হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (৭ই মে, ১৮৬১- ৭ই আগষ্ট, ১৯৪১) জীবন ও সাহিত্যে রামায়ণ ও মহাভারত – এই দুই মহাকাব্যের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। সাহিত্যে যখন আমরা কোন বিষয়কে লক্ষ্য করি তখন সেই বিষয়টি লেখকের জীবনে কীভাবে ছাপ ফেলেছিল, সে বিষয়টি সবার প্রথমে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। আমার গবেষণার লক্ষ্য যেহেতু রবীন্দ্রসাহিত্যে ‘রামায়ণ’ এবং ‘মহাভারত’-কে অ্যাড্যাপ্টেইশন্

থিয়োরির আলোকে বিশ্লেষণ করা, তাই এই দুই মহাকাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মানসিকতা নিয়ে কিছু কথা বলা জরুরী। এই অধ্যায়ে রবীন্দ্র মননে কীভাবে ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’ – এই দুই মহাকাব্যদ্বয় স্থায়ী জায়গা করে নিচ্ছে তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই দুই মহাকাব্যের স্থায়ী প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাও থাকছে এই অধ্যায়ে।

তৃতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্র কাব্যসাহিত্যে ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’-এর গ্রহণ-প্রতিগ্রহণ

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যসাহিত্যের সুবিশাল ভাণ্ডারে নানাভাবে রামায়ণ-মহাভারতের বিভিন্ন প্রসঙ্গকে সাহিত্যিক উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কবিতার আঙ্গিকে মহাকাব্যের কাহিনিকে পরিবেশনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রভাবনা অনেক বেশি গভীর এবং কবির বিশ্লেষণী মানসিকতার পরিচায়ক। প্রথমেই যে কবিতাটির প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে, তা হল ‘মানসী’ (১৮৯০ খ্রী.) কাব্যগ্রন্থের ‘অহল্যার প্রতি’ কবিতা। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কৃত্তিবাসী রামায়ণের অহল্যার পাষণ্ডে পরিণত হওয়ার বৃত্তান্তকে ছন্দে সাজালেন নিজস্ব মানসিক অভিপ্রায়ে। রবীন্দ্রনাথের আধুনিক দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে পাষণ্ডী অহল্যার সেই সময়ের ছবি, তাঁর হাহাকার, তাঁর যন্ত্রণা যা রামায়ণকার উপেক্ষা করে গেছেন। রামায়ণের অহল্যা চরিত্রটিকে ভিন্নভাবে কবিতার আঙ্গিকে উপস্থাপন করলেন কবি। ফলে মূল মহাকাব্যের কাহিনীর সরলতা আর রইল না। তাতে কবির জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধিৎসু বাস্তববাদী আধুনিক মানুষের সন্দেহ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠতে দেখি। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে যেমন রামায়ণকারের উপাখ্যান গৃহীত হয়েছে তেমন শেষ পর্যন্ত সেখানে তাঁর নিজস্ব ভাবনা ও বক্তব্য স্থান করে নিয়েছে। যেটিকে আমি রিসেপশন্ তথা গ্রহণ এবং অ্যাড্যাপ্টেইশন্ তথা প্রতিগ্রহণ বলতে চেয়েছি। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য যে সকল কবিতায় ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’ – এর রিসেপশন্ তথা গ্রহণ এবং অ্যাড্যাপ্টেইশন্ তথা প্রতিগ্রহণ হয়েছে সেগুলি হল – ‘কাহিনী’ (১৯০০ খ্রী.) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘ভাষা ও ছন্দ’ এবং ‘পতিতা’ কবিতা, ‘মানসী’ (১৮৯০ খ্রী.) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘অহল্যার প্রতি’ ও ‘দেশের উন্নতি’ কবিতা, ‘সোনারতরী’ (১৮৯৪ খ্রী.) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘পুরস্কার’ কবিতা, ‘চিত্রা’ (১৮৯৬ খ্রী.) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘নগরসংগীত’ কবিতা, ‘শেষ সপ্তক’ (১৯৩৫ খ্রী.) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘তিন – সংখ্যক’ কবিতা এবং ‘আকাশপ্রদীপ’ (১৯৩৯ খ্রী.) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘যাত্রাপথ’ কবিতা। এই কবিতাগুলিতে কীভাবে ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’-এর রিসেপশন্ তথা গ্রহণ এবং অ্যাড্যাপ্টেইশন্ তথা প্রতিগ্রহণ হয়েছে তার আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

চতুর্থ অধ্যায়

রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যে ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’-এর গ্রহণ-প্রতিগ্রহণ

রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্যে অ্যাড্যাপ্টেইশন্ থিয়োরি অনুসারে কীভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকের নির্মাণ করছেন, এই অধ্যায়ে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আলোচনা চারটি শিল্পরূপের মধ্যে বিন্যস্ত হয়েছে। প্রথমে আলোচনা হয়েছে গীতিনাট ‘বাল্মীকি প্রতিভা’ (১৮৮১ খ্রী.) এবং ‘কালমৃগয়া’ (১৮৮২ খ্রী.) নিয়ে। তারপর আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে রবীন্দ্র কাব্যনাট্যগুলি যথাক্রমে ‘চিত্রাঙ্গদা’ (১৮৯২ খ্রী.), ‘বিদায় অভিষাপ’ (১৮৯৪ খ্রী.), ‘গান্ধারীর আবেদন’ (আনুমানিক ১৮৯৭ খ্রী.), ‘নরকবাস’ (আনুমানিক ১৮৯৭ খ্রী.), ও ‘কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ’ (১৯০০ খ্রী.)। নৃত্যনাট্য ‘চিত্রাঙ্গদা’ যেহেতু অ্যাড্যাপ্টেইশন্ তত্ত্বের আধারে আলোচিত একমাত্র নৃত্যনাট্য, তাই কাব্যনাট্য ‘চিত্রাঙ্গদা’ এবং নৃত্যনাট্য ‘চিত্রাঙ্গদা’ – এই দুটির আলোচনা একসঙ্গে করা হয়েছে অ্যাড্যাপ্টেইশন্ থিয়োরির প্রয়োগকে সুস্পষ্টভাবে বোঝানোর জন্য। তারপর রূপক-সাংকেতিক নাটক ‘রক্তকরবী’ (১৯২৬ খ্রী.) আলোচনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যে অ্যাড্যাপ্টেইশন্ থিয়োরির আলোকে রিসেপ্শন্ তথা গ্রহণ এবং অ্যাড্যাপ্টেইশন্ তথা প্রতিগ্রহণ কীভাবে হয়েছে তার আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

পঞ্চম অধ্যায়

রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’-এর এর গ্রহণ-প্রতিগ্রহণ

রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে নানাভাবে ঘুরে ফিরে এসেছে ‘রামায়ণ’ ‘মহাভারত’-এর প্রসঙ্গ। সেই সঙ্গে উঠে এসেছে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব আধুনিক ব্যাখ্যা এবং তার স্বকীয় রূপায়ণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপন্যাস রচনা করেছেন প্রায় তেরোটি। প্রথম যে উপন্যাসটি নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে, সেটি হল ‘রাজর্ষি’ (১৮৮৭ খ্রী.) উপন্যাস। এই উপন্যাসে রাজা গোবিন্দমাণিক্য যখন ভাই নক্ষত্র রায়ের আক্রমণের প্রসঙ্গ নিয়ে নতুন পুরহিত বিল্বনের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন, তখন কথোপকথনের সময় উঠে এসেছে মহাভারতের প্রসঙ্গ। এই বক্তব্যের মধ্যেই এই উপন্যাসের মূল ভাব নিহিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’-এর অ্যাড্যাপ্টেইশন্ তথা প্রতিগ্রহণ সে অর্থে না করলেও কিছু ভাব বা অনুষ্ঙ্গকে তিনি রিসেপ্শন্ তথা গ্রহণ করে প্রয়োগ করেছেন অন্যভাবে। যার আলোচনা ও বিশ্লেষণ এই অধ্যায়ে করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য যে উপন্যাসগুলিতে ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’-এর প্রসঙ্গ আমরা পেয়েছি সেগুলি হল - ‘নৌকাডুবি’ (১৯০৬ খ্রী.), ‘প্রজাপতির নির্বন্ধ’ (১৯০৮ খ্রী.),

‘ঘরে বাইরে’ (১৯১৬ খ্রী.), ‘যোগাযোগ’ (১৯২৯ খ্রী.), ও ‘চার অধ্যায়’ (১৯৩৪ খ্রী.) উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত মোট গল্পের সংখ্যা আনুমানিক ১১৯ টি। ‘গল্পগুচ্ছ’ (১৯২৬-২৭) এর অন্তর্গত যে গল্পটি মূল্যবান আমাদের আলোচ্য সেটি হল ‘রাজপথের কথা’। এই গল্পে রামায়ণের কাহিনির রিসেপশন্ তথা গ্রহণ এবং অ্যাডাপ্টেইশন্ তথা প্রতিগ্রহণ কীভাবে হয়েছে তার আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। এছাড়া অন্যান্য যে গল্পগুলি আমাদের আলোচ্য তা হল - ‘গল্পগুচ্ছ’-এর অন্তর্গত ‘কঙ্কাল’, ‘মুক্তির উপায়’, ‘জয়পরাজয়’, ‘অধ্যাপক’, ‘দৃষ্টিদান’, ‘সদর ও অনন্দর’, ‘যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ’, ‘নষ্টনীড়’, ‘রাসমণির ছেলে’, ‘পণরক্ষা’, ‘হৈমন্তী’, ‘প্রগতিসংহার’। ‘লিপিকা’-র অন্তর্গত যে গল্পটি আমাদের আলোচ্য সেটি হল- ‘পুনরাবৃত্তি’। ‘সে’ গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত যে গল্পটি আমাদের আলোচ্য সেটি হল - ‘রিপোর্ট’। ‘তিনসঙ্গী’ গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত আমাদের আলোচ্য গল্পটি হল - ‘ল্যাবরেটরি’, ‘শেষ কথা’-র পাঠান্তর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রবীন্দ্র প্রবন্ধসমগ্র ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’-এর এর গ্রহণ-প্রতিগ্রহণ

রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন অজস্র প্রবন্ধ রচনা করেছেন যা বিভিন্ন প্রবন্ধগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’-কে রবীন্দ্রদৃষ্টিতে বিশ্লেষণের প্রধান মানদণ্ডই হল তাঁর প্রবন্ধসাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ যে আধুনিক দৃষ্টিতে ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’-কে দেখেছেন তা আমাদের নতুনভাবে ভাবতে সাহায্য করে। এই অধ্যায়ে যে সকল প্রবন্ধগ্রন্থগুলি নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে সেগুলি হল - ‘বিবিধ প্রসঙ্গ’ (১৮৮৩ খ্রী.), ‘আলোচনা’ (১৮৮৫ খ্রী.), ‘সমালোচনা’ (১৮৮৮ খ্রী.), ‘যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি’ (১৮৯১ খ্রী.), ‘পঞ্চভূত’ (১৮৯৭ খ্রী.), ‘আত্মশক্তি’ (১৯০৫ খ্রী.), ‘ভারতবর্ষ’ (১৯০৬ খ্রী.), ‘বিচিত্র প্রবন্ধ’ (১৯০৭ খ্রী.), ‘প্রাচীন সাহিত্য’ (১৯০৭ খ্রী.), ‘সাহিত্য’ (১৯০৭ খ্রী.), ‘আধুনিক সাহিত্য’ (১৯০৭ খ্রী.), ‘রাজা প্রজা’ (১৯০৮ খ্রী.), ‘সমাজ’ (১৯০৮ খ্রী.), ‘শিক্ষা’ (১৯০৮ খ্রী.), ‘বাংলা শব্দতত্ত্ব’ (১৯০৯ খ্রী.), ‘ধর্ম’ (১৯০৯ খ্রী.), ‘জীবন-স্মৃতি’ (১৯১২ খ্রী.), ‘পরিচয়’ (১৯১৬ খ্রী.), ‘যাত্রী’ (১৯২৯ খ্রী.), ‘জাপানে-পারস্যে’ (১৯৪২ খ্রী.), ‘কালান্তর’ (১৯৩৭ খ্রী.), ‘সাহিত্যের স্বরূপ’ (১৯৪৩ খ্রী.), ‘পল্লীপ্রকৃতি’ (১৯৬২ খ্রী.)। এই প্রতিটি প্রবন্ধগ্রন্থে অনেকগুলি করে প্রবন্ধ রয়েছে। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে যেগুলিতে ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’-এর রিসেপশন্ তথা গ্রহণ এবং অ্যাডাপ্টেইশন্ তথা প্রতিগ্রহণ হয়েছে, তার আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

উপসংহার

উপরোক্ত ছ'টি অধ্যায়ের বিশদলোচনা ও মূল্যায়নের দ্বারা রবীন্দ্রসাহিত্যে 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'-এর রিসেপশন্ তথা গ্রহণ এবং অ্যাডাপ্টেইশন্ কীভাবে সংঘটিত হয়ে কালজয়ী সাহিত্য হিসেবে বাংলা সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে এবং কেন এই সম্পূর্ণ বিষয়টিকে আমি অ্যাডাপ্টেইশন্ তত্ত্বের চশমায় দেখতে শুরু করলাম, গবেষণার সমাপ্তিতে এসে আমি সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি।